ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

জুলফিকার মতিনের *মানব মানবী*[১]: শৈলী-সমীক্ষা

পুরনজিত মহালদার*

সারসংক্ষেপ : পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য মানুষের সনাতন ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনায় প্রবলভাবে ফাটল ধরায়। সমস্ত রীতি-নীতি, বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ ও প্রেমধারণা সংশয় ও সংকটের মুখাপেক্ষী হয়ে দাড়ায়। নব্বই দশকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমাজজীবনে এ অবস্থার ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশী। যার শিল্পিত রূপ উঠে এসেছে সমসাময়িক উপন্যাসে। শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের নৈতিক স্খলন, লোলুপতাপূর্ণ দেহজ কামনা-বাসনা, মূল্যবোধের অসংগতি, অর্থসসর্বস্বতা, ব্যক্তির আত্মিক সংকটসহ বহুমুখী টানা-পোড়েনের বিস্তৃত চিত্রায়ন পাওয়া যায় এ সময়ের উপন্যাসে। তন্মধ্যে সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫), শওকত আলী (১৯৩৬), আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-৯৭) আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১), আবদুল্লাহ আল মানুন (১৯৪৩-২০০৭), সেলিনা হোসেন (১৯৪৭), জুলফিকার মতিন (১৯৪৩) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। জুলফিকার মতিনের *মানব মানবী* (১৯৯৬) উপন্যাসে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণাপুষ্ট মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের নৈরাশ্যবোধ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার চিত্র কিভাবে উঠে এসেছে তা এই প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় ।

সময় ও সমাজজীবনের নানাবিধ দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমাজস্থিত মানুষের মানস-প্রবণতার সম্পর্ক নির্ণয় করার তাগিদ অনুভব করেছেন জুলফিকার মতিন। লেখকের সামগ্রিক জীবনবোধের ভেতর থেকেই রচনার ইমেজ সৃষ্টি হয়। উপন্যাস-রচনায় তিনি ভাবাবেগের চেয়ে মননধর্মীতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। চরিত্রের সব ধরণের আবেগের ক্ষেত্রে দিয়েছেন সংযমের পরিচয়। শুধুমাত্র পাঠকনন্দিত হওয়ার আশায় উপন্যাস রচনা করেননি তিনি। এবং উপর্যুক্ত প্রবণতাই তাঁর ঔপন্যাসিক সিদ্ধির ক্ষেত্রে রেখেছে সহায়ক ভূমিকা। শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্যা ও সংকট রূপায়ণের দৃশ্যমান পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার পরিবর্তে গুরুত্ব লাভ করেছে চরিত্রের অন্তর্লোকের জটিলতা। সামাজিক জীবনের বহুবিধ অসঙ্গতি ও অনৈক্যই তাঁর উপন্যাসে ঘুরে ফিরে সামনে এসেছে। উপন্যাসের বিষয় নির্ধারণ এবং প্রকরণ নির্মাণে তিনি আধুনিকমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। পটভূমি তৈরি, প্লট নির্মাণ, চরিত্রায়ন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাহিনীর পরিসমাপ্তি সর্বত্রই তাঁর মননশীল পরিচর্যার সাক্ষর বিদ্যমান। সমাজে

* এম.ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদ্যমান সংকটের সাথে সমাজস্থিত মানুষের পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের শিল্প প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

জুলফিকার মতিন এই উপন্যাসে নির্বাচন করেছেন কৈশোর প্রেমের প্লট। প্রণয়কেন্দ্রিক প্লটের দ্বারা তিনি আলো ফেলতে চেয়েছেন আধুনিক বলা যায় অতি আধুনিক মানব-মানবীর সামগ্রিক জীবনের বহুভূজ সংকটের ওপর। উপন্যাসের নায়ক চরিত্র আফজালের সাথে তার কৈশোর প্রণয়ী শায়লার নাটকীয় সাক্ষাতের মধ্য দিয়েই পর্দা উঠেছে উপন্যাসের। শুরুতেই কাহিনীর শক্ত গাঠনিক ভিত্তিতে পাঠক আকর্ষিত হয়। গল্পের মূল বিষয় বা অনুষঙ্গ সম্পর্কিকত ধারণা বা বোধকে স্পষ্ট করে ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কের সামন্তস্যতা বজায় রেখে সীনিক প্লটের উপস্থাপন পদ্ধতিতে প্লট বিন্যাসে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। আস্তে আস্তে তিনি কাহিনী ও চরিত্রের গভীরে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তুলে ধরেছেন তাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে আফজাল শায়লার কৈশোর প্রেমের রোমাঞ্চবার ঘটনার বর্ণনা লক্ষ্যনীয়। জীবন বাস্তবতার কাছে যে কৈশোর প্রেম, স্বপ্ন, ভালবাসা পর্যুদস্তে, অস্তিত্বহীন, বিবর্ণ ধূসর হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ করে শায়লা আফজালের সাক্ষাতের তা আবার নতুন করে হৃদয় আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ভেসে ওঠে। সংলাপের খনজুতায় প্রকাশিত হয়েছে শায়লা আফজালোর বহিজগত ও অন্তর্জগতের নানাবিধ কষ্ট-বেদনার কথা। অতিথি ভবনে শায়লার বক্তব্রে প্রকাশিত হয়েছে সমাজভ্যন্তরের কেদাক্ততা । সর্বদর্শী লেখকের ভূমিকায় জুলফিকার মতিন জীবনবোধে যোগ করেছেন নুতন মাত্রা। আধুনিকমনস্ক চরিত্রের মনোজাগতিক জঠিলতা ও দ্বিধাগ্রস্থতা, পারিবারিক জীবনের সন্দেহ অবিশ্বাস, নারীর আত্মস্বরূপ উন্মোচন সর্বোপরী জীবন ও জগতের প্রতি একটা আপাত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে এই উপন্যাসে।

হঠাৎ করে পূর্ব প্রণয়ীর সঙ্গে দেখা হওয়ার মধ্য দিয়ে উভযের জীবনের জটিলতা আর সঙ্কটের উন্মোচন করেছেন লেখক। কারও পারিবারিক জীবনের মধ্যে সরাসরি তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব দেখাননি তিনি। যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ঘরে বাইরে, চোখের বালি;* শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *গৃহদাহ*তে আমরা দেখতে পাই। সমস্যা পাঠকের ধারণাগত বলেই মনে হয়। জুলফিকার মতিন এখানে অল্পকথায় বেশি বলে দিয়েছেন। নায়িকার পারিবারিক দ্বন্দ্বের আভাস না দিলেও প্লটের ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হতো বলে মনে হয় না। সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তার মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী মানুষের ক্লেদাক্ত জীবনাচরণের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ উপন্যাসের সমস্যার বীজ রোপিত হয়েছে নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব, তাদের হৃদয়েলোকের সন্দেহ অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। তাদের আত্মসংকট আর আত্মদহনই উপন্যাসের প্রধান সমস্যা হিসেবে সামনে আসে।

চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে লেখক চরিত্রের অভ্যন্তরীণ ফমস্যাকে বড় করে দেখেছেন। অধিকাংশক্ষেত্রে চরিত্রগুলোর পারস্পরিক বিরোধাচরণের কোন কার্যকারণ সূত্র ঘটনাকেন্দ্রিক

না হওয়ায় তা পাঠকের বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। কাহিনীবলয়ের মধ্যে মধ্যবিত্তমানসের সংকট চিত্রণের আভাস সূচনাপর্বেই বিদ্যমান। বাইরের সঙ্কট আর বিপর্যয়কে চরিত্রের মধ্যে আরোপন করেছেন। জীবন সম্পর্কে চরিত্রগুলোর ঔদাসীন্য, প্রেমে ব্যর্থতা, পুঁজিবাদী সমাজের সাথে নিজেদের মেলাতে না পারার মধ্য দিয়ে প্রধান চরিত্রগুলো আত্মদ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে মনোজাগতিক জটিলতার গহবরে নিমজ্জিত হয়েছে। মূলত শায়লা আফজালের সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখেই জুলফিকার মতিন সমসগ্য উপন্যাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন সমস্যার জটিল জাল। কৈশোর প্রেমিকের প্রতি নায়িকার আকর্ষণ, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা, পালিত সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, নায়কের বিবাহিত জীবনের ঘটনা অবহিত হওয়া-সবকিছু মিলিয়ে জীবনের প্রতি জেগে উঠেছে তার প্রচণ্ড নৈরাশ্যবোধ। নায়ক-নায়িকার এই দোলাচলপ্রবৃত্তি, ভেতর বাইরের আকর্ষণ- বিকষর্ণের ত্রিশঙ্কু অবস্থা তাদের নিয়ে গিছে জটিল মনস্তত্ত্বের আঁধারে। উপন্যাসের কিছু ঘটনাংশ ফ্ল্যাশব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরোয়াত পদ্ধতিতে বিকশিত হয়েছে। সময়কে কখনো পেছনে নিয়ে কখনো সামনে টেনে, কখনোবা থামিয়ে দিয়ে উন্মোচন করেছেন মানব-মানবীর অর্ন্তলোক। সময়ের এই বহূমাত্রিক ব্যবহার জুলফিকার মতিনের প্রকরণ-শৈলির অভিনবত্বের অন্যতম উৎস।

ঔপন্যাসিক কুতুব সাহেবের চরিত্রটিকে এনেছেন উপন্যাসের মিমাংসা আর সমাপ্তির প্রয়োজনে। উপন্যাসসের মূল সমস্যার সমাধান এবং চরিত্রের উন্মুলিত অবস্থার অবস্থান দেখিয়েছেন কুতুবুদ্দিন চরিত্রের মাধ্যমে। অন্যদিকে সারথি, হুসনা, জবদুল, মনজুর হোসেন, কবরের নিঃসঙ্গ লোকটি এবং রহমান সাহেবের অবস্থান স্বল্প পরিসরে হলেও প্রধান চরিদ্বয়ের গাঠনিক ভিত্তি দৃঢ় করতে তাদের উত্তরণ ও লয়, এবং কাহিনীর নতুন নতুন বিন্যাস সাধনে এরা পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দ্বন্দ্বসংকুল মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের অসহনীয় যন্ত্রণা, আত্মদ্বন্দ্বের তীব্র জ্বালা, নৈসঙ্গের বোঝা এবং নিসঙ্গতার বৃত্ত হতে বের হবার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে। বৈচিত্র্যময় বিষয় ভাবনার সঙ্গে উপন্যাসের প্রকরণ পরিচর্যা ও শৈলী নিরীক্ষায় লেখকের শিল্পী- স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সমাজচিত্রের উপরিভাগের যথাযথ বিবরণধর্মী বাস্তবতার পরিবর্তে এখানে অন্তর্জীবনের গভীরতর বাস্তবতা (inner reality) সন্ধান, অঙ্কিত চরিত্রের আত্মানুসন্ধান (search for indentity), অবচেতন আকাঙ্ক্ষার রূপায়ন, চেতনাপ্রবাহ (Strecem of consciousness) রীতির ব্যবহার তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

লেখক হিসেবে জুলফিকার মতিন পুঁজিবাদী জীবন-ভাবনার মধ্যে সমাজস্থিত মানুষের অবস্থান নির্ণয় করার দূরূহ কাজে সফলকাম হয়েছেন। লেখকের সামগ্রিক জীবনবোধের ভেতর থেকেই রচনার ইমেজ আসে। জুলফিকার মতিন সমাজবিন্যাসের নানাদিকে বিশেষ করে সামাজিক সমস্যার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করেছেন যা উপন্যাসের বিষয়বস্তুর জন্যই প্রয়োজনীয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সময় ও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে তিনি এমন এক অনুষঙ্গকে উপন্যাসের বিষয় হিসেবে রূপদান করেছেন যা সময়ের প্রেক্ষিতে অসামান্য।

মানব-মানবী উপন্যাস তেরটি পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থের শুরুতেই লেখক চরিত্রের মনোভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত মন্ময় দৃষ্টিতে দেখা সংক্ষিপ্ত পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'অপরিচ্ছন্ন, অপরিকল্পিত'শহরের সীমা ছাড়িয়ে অবস্থিত দামি অতিথি ভবনকে । মধ্যবিত্ত মানস বিরোধী কিলবিল করা মানুষের নোংরা ঘামের গন্ধ বা কলুষতা এই ভবনকে স্পর্শ করতে না পারলেও ওই ভবনে বসবাসকারী মধ্যবিত্তের আত্মিকজগত কলুষমুক্ত নয়। তাই ঔপন্যাসিক কাহিনীর শুরুতেই দামি অতিথি ভবনে প্রধান পাত্র-পাত্রী অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাকে উপস্থিত করে তাদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আভাস দিয়ে প্রথম থেকেই একটি মূল সুর ধরিয়ে দিয়েছেন।

উপন্যাসের নায়ক আফজালের সাথে তার কৈশোর প্রণয়ী শায়লার নাটকীয় দেখা। 'তুমি না একসময় আমাকে ভালবাসতে? সেই যে চিঠি লিখেছিলে?' 'চেনা কিংবা অচেনা মহিলা'র এই হঠাৎ নাটকীয়তায় আফজাল বিমর্ষবোধ করে। শুরুতেই কাহিনীর শক্ত গাঠনিক ভিত্তিতে পাঠক আকর্ষিত হয়। লেখক উপন্যাসের বিষয় হিসেবে মানবজীবনের স্পর্শকাতর বিষয় প্রেম-ভালবাসাকে কেন্দ্র করে মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে নিয়ে এসেছেন সবার সামনে । গল্পের মূল বিষয় বা অনুষঙ্গ সম্পর্কিত ধারনা বা বোধকে স্পষ্ট করে ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কের সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে সীনিক প্লটের উপস্থাপন পদ্ধতিতে প্লট বিন্যাসে লেখক অগ্রসর হয়েছেন। আস্তে আস্তে তিনি কাহিনী ও চরিত্রের গভীরে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তুলে ধরেছেন তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে আফজাল-শায়লার কৈশোর প্রেমের রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা লক্ষ্যণীয়। তাদের অগভীর প্রেম পূর্ণতা পাওয়ার পূর্বেই রহমান সাহেবের সাথে শায়লার বিয়ে হয়ে যায়। আফজালের নিবেদন করা 'হৃদয়ের অর্ঘ' শায়লার কাছে 'নিরাকার' বলে মনে হয়েছিল, আর 'যে বস্তুগুলোর আকার আছে, মানে শাড়ি বাড়ি গহনা গাড়ি যার কাছ থেকে

ভাল পাওয়া যাবে তাকেই বিয়ে করে ফেলি, ' আফজালের উপর্যুক্ত বক্তব্য যেন পুঁজিবাদী জীবনের পণ্য সর্বস্বতার কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা। জীবন বাস্তবতার কাছে যে কৈশোর প্রেম স্বপ্ন ভালবাসা পর্যুদস্ত, অস্তিত্ববিহীন, বিবর্ণ, ধূসর হয়ে গিয়েছিলো হঠাৎ করে শায়লা-আফজালের সাক্ষাতে তা আবার নতুন করে হৃদয়-আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ভেসে ওঠে। সংলাপের ঋজুতায় প্রকাশিত হয় শায়লা-আফজালের বহির্জগত ও অন্তজর্গতের নানাবিধ কষ্ট বেদনার কথা। প্রকাশিত হয় সমাজাভ্যন্তরের ক্লেদাক্ততার কথা। অতিথি ভবন সম্পর্কে শায়লা বলে- 'এ হচ্ছে দেশের মধ্যে দেশ। যাদের টাকা-পয়সা আছে তারা নিজেদের জন্য এসব বানিয়ে নিয়েছে। কোথাও কোনো সংঘাত হচ্ছে না। পারফেক্ট শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। যার হাত তুলে কাঁদার কথা সে কাঁদছে। যার হাত দিয়ে সব বাগিয়ে নেওয়ার কথা সে তা নিচ্ছে।' দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শায়লা-আফজালের স্মৃতিচারণ চলেছে । দুজন দুজনের অতি কাছাকাছি এলেও আবেগময় মুহূর্তে একে অপরের স্পর্শসীমায় উপনীত হলেও দেহজ কামনা-বাসনার স্থূলতা তাদের প্রেম চেতনাকে কলুষিত করতে পারেনি। 'আফজাল সোজা

এগিয়ে আসে। একেবারে শায়লার সামনে। ডানহাত দিয়ে তার থুতনিটা তুলে ধরে।" শায়লার ভাবনা হয় যে, আফজাল হয়ত এখনি পাশবিক আচরণ শুরু করবে। কিন্তু দেখে সেসব কিছু নেই। কাঠিন্য নেই। নির্মমতা নেই, সে চোখ নামিয়ে নেয়। সহসাই উপুড় হয়ে মুখ গুজে দেয় সোফাতে।' শায়লার স্বপ্নভঙ্গের কথা, প্রেমহীন হৃদয়ের হাহাকারের কথা, আফজালকে না পাওয়ার কষ্টের তীব্রতার কথা চোখের জলের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। স্বপ্নভঙ্গের বেদনার বহ্নিশিখায় শায়লার অন্তর্জগত পুড়তে থাকে সর্বক্ষণ। আমাদের চার পাশের পরিচিত জীবন সম্পর্কে উপলব্ধিবোধ এবং দৈনন্দিন জীবনায়নের মধ্যে বিশেষ মূল্যবোধের আবিষ্কার কথাসাহিত্যের অন্যতম দিক। *মানব মানবী*-তে জুলফিকার মতিন নিঃসন্দেহে তা উতরে গেছেন। আমাদের চৈতন্য দিয়ে সচরাচর যে সমস্ত বিষয়কে সহজে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা অথচ মনের পর্দায় দাগ কেটে যায় *মানব মানবী* তে তার অসামান্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত প্লটের সরলরৈখিক গতিতে অতীত স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আফজাল-শায়লার অন্তর্জগতের বিষণ্নতা, দাম্পত্য জীবনের অস্থিতিশীলতা, অস্বস্তিবোধ, দ্বিধাগ্রস্থতা বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে বুর্জোয়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি শায়লার ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য: 'সব ভাবাটা তো তোমাদের একচেটিয়া। আমাদের অধিকার শুধু জেনে নেবার। তাও আবার সবসময় নয়।' ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী আধুনিক মানুষগুলো নিজস্ব অবস্থান নিয়ে সদাসতর্ক। নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষায় আপ্রাণ প্রয়াসী।

জুলফিকার মতিন এই উপন্যাসে চরিত্রের আত্মকথন, আত্মবিশ্লেষণ, ও আত্মসন্ধানের মধ্য দিয়ে চরিত্রায়ণ, দৃষ্টিকোণ প্লটবিন্যাস, সময়ধারন, ভাষাপ্রয়োগ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফর্ম-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিলুপ্তপ্রায় স্মৃতিচারণে আফজাল নতুন আস্বাদ পায়। চেতনার গভীরে প্রোথিত হয় কৈশোর প্রেমের শেকড়। দ্বন্দ্বাবর্তনের মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে অসহনীয় অস্বস্তিতে ভোগে আফজাল। জীবনপথের নানা সংঘাত ও আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত আফজাল পথের দিশা হারিয়ে অন্ধকারে-অবচেতনে খুজতে থাকে শান্তি, স্থিতি আর ভালবাসার পরশ। অবশ্য কোনকিছুই তাকে শেষ পর্যন্ত শায়লার সাথে সরলরৈখিক পথে হাটতে প্রেরণা জোগাতে পারে না। একটা আপাত নৈরাশ্যবোধ অহর্নিশ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। দ্বন্দ্বাবর্ত চিন্তা-ভাবনাগুলো গোল পাকিয়ে তার মস্তিষ্ককে বিকল করে ফেলে। রাতের নিকষ কালো অন্ধকারই তার কাছে পরম আশ্রয় বলে প্রতিভাত হয়। বাইরের জগতের প্রখরতার সাথে অন্তর্জগতের মানবী শায়লাকে মেলাতে না পারার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে আফজাল। প্লটের গতি এ পর্যন্ত একই উচ্চতায় এগিয়ে চলে। প্লটকে অনিবার্য, যুক্তিগ্রাহ্য, ও নাটকীয় করতে লেখক আফজালকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় নিয়ে যান কবরস্থানে। কবরস্থানে বসে আফজালের জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত অজানা রহস্যের দার্শনিক তত্ত্বকথা 'জীবনের সমস্ত কীর্তির বিনাশ ঘটে সমাধিতে। মৃত্যুর পর মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল এই সমাধি। তারপর কী হয় কেউ জানে না।' কবরস্থানের পুত্র-কন্যা-স্ত্রী হারানো লোকটির আবির্ভাব কাহিনীতে নতুন মাত্রা যোগ করে। মানবিক বন্ধন, মানবিক মহিমায় গরিয়ান

কবরস্থানের লোকটিকে দেখে সংসার বিচ্ছিন্ন সত্তাবিচ্ছিন্ন আফজালের অন্তরাত্মা উদ্ভাসিত হয়ে মমত্বময় মনোজগতে অবস্থান নেয়। চতুর্থ অধ্যায়ে এসে প্লটের গতি বাক নেয়। কাহিনীতে চলে আসে পুঁজিবাদী সমাজের স্বার্থান্বেষী চরিত্র এন.জি.ও কর্মী মনজুর হোসেন এবং অর্থশালী ব্যক্তি জবদুল। লেখক সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তার মধ্য দিয়ে সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী মানুষের ক্লেদাক্ত জীবনাচারণের ভয়ানক চিত্র অঙ্কন করেছেন। অর্থনৈতিক চেতনাসর্বস্বতার এই সময়ে মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ, সম্পদের সঙ্গে এসেছে শয়তান, পঞ্চম অধ্যায়ে আবার শায়লার ভেতরের জীবনকাহিনী উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। শায়লা স্বামীর মদ্যপানের প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিকভাবে বললে আফজাল হতবাক হয়ে পড়ে: 'মনে হয় খুব সূক্ষ্ম একটা তার ছিড়ে গেছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে না। কিন্তু নারীজীবনের নিষ্ফলতার একটা হাহাকার মর্মরিত হয়ে চলেছে। কেবল এটুকুইকি শায়লার দুঃখ? তা কেন হবে? শায়লা নিজেই বলেছে ও মক্ষীরাণী। এ কি হাসি দিয়ে কষ্ট ঢাকবার প্রয়াস না?' আফজালের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জড়ো হয়। যে শায়লাকে পেলে একসময় হৃদয়ের বর্ণিলতা মুছে দিতো চারপাশের বাস্তবতাকে' আর আজ সেই 'শায়লাকে ফুসলিয়ে নিয়েত গেলাম তারপর?' আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত আফজালের কাছে তার আত্মপ্রতিচ্ছবি বড় বেমানান মনে হয়।

সারথী চরিত্র স্থান, কাল, পাত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে প্লটে নুতন গ্রন্থি রচনা করেছে। উপন্যাসে সারথীর অবস্থান স্বল্প সময়ের। সারথী শায়লার সন্তান তবে গর্ভজাত নয়। দাম্পত্য জীবনে একবারই সন্তান ধারণ করার গৌরবে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হয়েছিল তার। কিন্তু মৃত্ত সন্তান প্রসব করায় এবং বড় দুটো অপারেশনের 'ধাক্কায় সন্তান ধারনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার বেদনা তাকে দিনে দিনে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে সে হয়ে ওঠে বেপরোয়া।' শায়লার স্বামী মি.এম. ইউ রহমান দুর্জ্ঞেয় কারণে আর বিয়ে করেননি। এতিমখানা থেকে সারথীকে এনে দিলেন শায়লার কাছে। সারথীকে গ্রহণ করতে শায়লার দ্বিধা । তাই সে বলেছিলো 'আসলে এটি তোমারই ছেলে। এখন এনে চাপাচ্ছ আমার ঘাড়ে। কার পেটে বানিয়েছো বলো?' শায়লার এই নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা দূর হয়ে যায় সারথীর প্রতি রহমান সাহেবের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি হিংসাপরায়ণ আচরণ দেখে। 'এখন আর শায়লা সারথীকে নিজের ছেলে ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না।' কিন্তু আফজালের উপস্থিতি তার অবসাদগ্রস্ততাকে বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। 'ফেরার সময় মনে হয় সে খুব ক্লান্ত তবে এই অবসাদগ্রস্ত জীবনের বুঝি কোনো নিরাময় নেই। এটি কেবল ভাবনা হিসেবে থাকে না, ভর করতে থাকে শরীরের ওপরও। সে বুঝতে পারে এর কোনো কারণ নেই। কিন্তু যেন এক সম্মোহন তাকে ঘিরে ধরেছে। তার অমোঘ আকর্ষণ থেকে মুক্তির উপায় কী? সত্যিই কি মানুষের জীবনবোধের ভিতর সবসময়েই এই নিষ্ফল ক্ষেত্র রায় যায়?'

মধ্যবিত্ত জীবনমানসের আরো কিছু খবর পাওয়া যায় সপ্তম অধ্যায়ে। সারথীর সূত্রে উপন্যাসে আসে নতুন চরিত্র কুতুবসাহেব। উপকাহিনীর সূত্রও সমস্যার বিবরণে অসাধারণ। আসলে লেখক ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে ছোট কাহিনীর একটি স্বল্পস্থায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করে মূল

সমস্যায় জাগিয়ে তুললেন পাঠককে। সরকারি চাকরীর অবসরকালে বিপত্নীক কুতুবসাহেব বাকী জীবনটা সন্তানদের কারও কাছে কাটাতে চাইলেও পারেন না। ছেলেদের একজন কানাডাতে আরেকজন অস্ট্রেলিয়ায়। পুঁজিবাদী সমাজে বেড়ে ওঠা সন্তানেরা নিজেরাই ভেবে নিয়েছে :' সেসব হল যৌবনের দেশ। তারুণ্যের দেশ। বুড়ো বাপকে নিয়ে গিয়ে করবেই বা কী তারা? বরং শেষ জীবনটা বাবা দেশের আলো বাতাসেই কাটিয়ে দিন, তার জন্য স্বাস্থ্যকরও বটে।' অন্যছেলে থাকে এখানেই। ছেলে-বউ স্বইচ্ছায় পিতার শেষ সম্বল পেনশনের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। একান্ত আত্মমুখীন ভাবনায় নিয়ন্ত্রিত চরিত্রের দৃষ্টান্ত কুতুবসাহেবের ছেলেরা। কিন্তু ' মানুষের মনোজগতে কত বিচিত্র্য ব্যাপার ঘটে; কত রহস্য লুকিয়ে থাকে সেখানে। তার কার্যকরণ সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে মর্মান্তিক হতে হয় কেবল।' সেই রহস্যের সূত্র ধরেই কুতুব সাহেব নতুন জীবন বিনির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন সফলতাও পেয়েছেন। রহমান সাহেবের বাড়িতে এসে সারথীর সাথে তার বেড়ে উঠল আস্থাবোধ, শ্রদ্ধা আর স্নেহের সম্পর্ক। সারথীকে শোনানো কুতুবসাহেবের গল্পের মধ্য নিয়ে লেখক তার রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। ৪৭-এর দেশভাগে সৃষ্ট সীমারেখায় পাড়ি জমানো কুতুবসাহেবের বাল্য বন্ধু অতীশের আর্ত-হাহাকার কিংবা বিভাগ পরবর্তীতে মুসলমানদের হিন্দু-বিদ্বেষী দাঙ্গায় মাস্টারমশাই কালী কিঙ্কর ভট্টাচার্যের আত্মগোপনের নিপূন বর্ণনা দেখে জুলফিকার মতিনকে শক্তিশালী গদ্যশিল্পী হিসেবে মর্যাদা দিতে আমাদের একটুও সংকোচ বোধ হয় না।

সারথীর জন্মদিনে রহমান সাহেবের বাড়িতে এসে আফজালের নানাবিধ অন্তর্জাগতিক চিন্তাস্রোত চলতে থাকে। আফজাল ভাবে: 'হতে পারে কোনো এক অজানা বাঁশির ডাক শুনবার জন্য শায়লার হৃদয়টা অস্থির থাকে। সুদূরের বাঁশী। নিজেও বুঝতে পারে না। কেবল হৃদয়ের তন্ত্রীতে ঘা লাগলেই সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায়?' কিংবা তার নিজের প্রতি রহমান সাহেবের সন্দেহ আছে কিনা, এছাড়া শায়লার মাতৃমূর্তি কল্পনা করে এক সৌন্দর্যাতীত প্রেমাকর্ষণে আফজাল আকর্ষিত হয়। 'সম্মোহন ছড়ায় আফজালের মনে। সে জানে নারীর এই রূপ স্পর্শাতীত। তাকে চুমু খাওয়া যায় না। রক্তমাংসের হাত সেখানে রাখলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। তবুও তার দিকে ধাবিত হওয়া থেকে আফজালের নিস্তার ঘটে না।'

আফজালের চৈতন্যে আলা-আধারির খেলা, আশা-নিরাশার দোলাচল, অতীত-বর্তমানের দ্বন্দ্ব তাকে প্রশান্তিতে থাকতে দেয় না। ফলে চেতন-অবচেতনে সে স্থিতি শান্তি খুঁজে ফেরে ঘুঘনিদানা বিক্রেতা আর তার পাড়ায় সাদাকাত সাহেবের জীবনে। স্ত্রী-সন্তানের ভাবনায় তার মধ্যে নৈরাশ্যবোধ কাজ করে। ফলে মানসিক স্থিতির জন্য, নিঃসীম শান্তির জন্য আফজাল ফিরে যায় জনমানব শূন্য কবরস্থানে প্রকৃতির বুকে। একদিকে প্রেমের 'জৈবিকতা', 'ভোগ স্পৃহা', অন্যদিকে সুগভীর বৈরাগ্যবোধ, অপার্থিবতার ছোয়া নিয়ে তার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় 'ভোগ-কামনাবিহীন জীবনের শুদ্ধ প্রকাশের এক নয়নাভিরাম

ল্যান্ডস্কেপ- শায়লাই তার প্রেম। তাই আফজাল সিদ্ধান্ত নেয়, সে পালাবে শায়লাকে নিয়ে । পালানো তার হয় না। গোপন রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট থেকে থানায় হামলা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে সারথীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। এই আকস্মিকতা প্লটের একটি অপরিহার্য ঘটনাসন্ধি। কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে প্লট এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সারথীর মৃতদেহ নিয়ে এখানেও লেখক রাজনৈতিক বাস্তবতার ছোয়া দিয়েছেন। 'একটি মৃতদেহ থেকে অভ্যুত্থানের। আপাতভাবে কল্পনায় আসেনা। কিন্তু দৃষ্টির অগোচরে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলাফল হতে পারে মারাত্মক।' সারথীর মৃত্যুতে আপাত শান্ত কিন্তু ভেতরে উত্তেজিত শায়লার কষ্ট, বেদনা, হতাশার কথা ভেসে উঠে তার সংলাপে- 'আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জান? মা বলে ডাকলেও ও আমাকে ভালবাসতে পারেনি। তা যদি পারত তবে ওর জীবনের সব কথা আমাকে বলত। ওর ভাললাগার কথা। ওর ঘৃণার কথা। ও কী চায় তার কথা। আমি হেরে গেছি। আমার সব অহংকার বিনষ্ট হয়ে গেছে।' শায়লার মতো আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত আফজাল কবরস্থানের লোকটির কথায় নিজের স্ত্রী, সন্তানের কথা মনে করে। সুতরাং 'পর দিন অতি প্রত্যুষে সে অতিথি ভবন পরিত্যাগ করে। শায়লাকে না জানিয়েই।'

আফজালের অতিথি ভবন পরিত্যাগের ঘটনায় কাহিনীতে নাটকীয় দ্রুততা এসেছে। এছাড়া মনজুর সাহেবদের জমি দেওয়া নিয়ে শায়লার মতামত পাল্টে যাওয়া, তার গৃহত্যাগ, তাদের আত্মীয় স্বজনদের রূঢ় আচরণ–সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে অনেকটাই নাটকীয় ঘটনার অনুবর্তী করেছে। বিশেষ করে শায়লার গৃহত্যাগে সমস্যা অনেক তীব্র হয়ে উঠছে।

আমাদের চারপাশের মানুষের মাঝে এমন অনেক মনজুর সাহেব রয়েছেন যারা পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে মানবিকতার ধার ধারে না। যাদের আমরা প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে বের হলেই দেখি। তাদের একজন উপন্যাসের মনজুর সাহেব। আফজাল-শায়লার হৃদয়ঘটিত প্রণয়ে বহির্জগত ও অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে অন্যান্য পাত্র-প্রাত্রীর সম্পর্ক স্থাপনে লেখকের অনন্য কৌশল লক্ষণীয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে এসে কুতুব সাহেবের বাড়িতে আফজাল-শায়লার পুনর্বার দেখা মূলত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসার ইঙ্গিত। তাদের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে নাটকের স্বাদ আছে। কিন্তু তারও পেছনে মনোজগতের অবশ্যাম্ভাবী শৃঙ্খল আছে। মনোজাগতিক জটিলতার শেকড় আরও গভীরে প্রোথিত থাকে। আফজাল-শায়লার মনের চেতন-অবচেতন মিশ্র সূত্রটি গভীরতর তাৎপর্যময়। জীবন পথের ক্লান্ত পথিক শায়লা গভীর রাতে কুতুব সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে 'প্রকৃতিক নগ্নতার' বুকে শেষ আশ্রয় নিতে চায়। কিন্তু আফজাল তাকে ধরে ফেললে শায়লা বলে: 'আমার নিরাবয়ব অস্থিত্বটা কি তুমি দেখতে পাও? তা যদি না দেখ তবে সব কাজের অর্থ খুজতে আস কেন?' দাপাদাপিতে ক্লান্ত, অবসন্ন, শায়লা 'শুভ্রাতের' উন্মুক্ত আকাশের খোলা প্রান্তরে আফজালকে দেখে বলে– 'তুমি এখনও আছ । হাতশ্বাসের সুরে আফজাল বলে- 'সময়কে থামিয়ে দিয়ে এখানে এভাবেই যদি থাকতে পারতাম চিরদিন'।

সময়ের যাতাকলে পিষ্ট আধুনিক মানুষ যন্ত্রণায় কাতরায়। মুক্তি তার ঘটে না। তাইতো রহমান সাহেবের সাথে শায়লার পুনর্যাত্রা। যাবার সময় রহমান সাহেব আফজালকে বলে, 'আপনিও চলুন না! দুদিন থাকবেন আমাদের সাথে' । একথা বললে শায়লার 'মৌল গ্রীবায় পরিতৃপ্তির ছবি দেখা যায়। লেখক শেষ পর্যন্ত আশাবাদকেই ধরে রাখেন।

জুলফিকার মতিনের উপন্যাসে শৈলীর সার্থকতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। গোষ্ঠীর অভিপ্রায়ের কাছে কীভাবে ব্যক্তির নিজত্বের, তার চাওয়া-পাওয়ার মৃত্যু ঘটে তা উপনাসে বিধৃত হয়েছে। ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার মর্মন্তুদ পরাজয় দেখে আমাদের মনে জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা জন্মায়। আত্মসংকটই *মানব-মানবী*র এক গুরুত্বপূর্ণ থীম। নিজেকে ভালভাবে বুঝতে না পারলে এবং সঠিক স্থানে স্থাপনে ব্যর্থ হলে মানুষ যে অস্বস্তিতে পড়ে যায় তার বিশ্বাস্য চিত্র পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। নায়ক-নায়িকার জীবনের মধ্যেই তা আভাসিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালের অনেক প্রশ্ন উদ্রেককারী মনস্তাত্ত্বিক বিষয় তার উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। লেখক যা কিছু অবলোকন করেন, উপলব্ধি করেন তা বিশ্বস্ত ও আন্তরিকতার সাথে উপস্থাপন করা তার কাজ ও দায়িত্ব । জুলফিকার মতিনও তাই করেছেন।

*মানব-মানবী*র চরিত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই গৃহীত। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে বিবর্তনশীল বা বিকাশমান চরিত্রগুলোর মনোজগত অজানা রহস্যে আবৃত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আফজাল, শায়লা, রহমানসাহেব, কুতুবসাহেব, মনজুরসাহেব সারথী ইনডিভিজুয়াল রাউন্ড ক্যারেকটার। অন্যদিকে অপ্রধান চরিত্র হুসনা, কর্মচারী, জবদুল, রাহেলা খাতুন, সারথীর বন্ধুরা হঠাৎ উকি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেও প্রধান চরিত্রগুলোকে বিকশিত করতে তাদের আবশ্যকতা অপরিসীম। চরিত্র নির্মাণে জুলফিকার মতিন অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্র বিশ্লেষণের উপযোগী সূক্ষ্ম চেতনা আছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। আর চরিত্রের মানস-প্রকৃতি, মেধা, পেশা, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা জানতে চরিত্রানুগ সংলাপের উপযোগিতা সর্বাগ্রে। জুলফিকার মতিন তা পূরণ করেছেন শিল্পিত স্বভাবে। রহমান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে রাহেলী খাতুনের বক্তব্য : 'ও একটা আস্ত ডাইনি। তুই পড়েছিস ঐ ডাইনির খপ্পরে। তোর নিজেরও ভালমন্দ জ্ঞান নেই? বউয়ের বশ হয়ে বসে আছিস? পুরুষমানুষ লজ্জা করে না?' তখন তার ব্যক্তিত্ব বা প্রবৃত্তি পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

মনস্তত্ত্বমূলক এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জুলফিকার মতিন ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলায় উপন্যাসটি বাস্তবসম্মত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে উঠেছে। যথাযথ ও উদ্দেশ্যমুখী ভাষা ব্যবহার করায় প্রকরণগত দাবি মেটাতে লেখক সক্ষম হয়েছেন। সর্বদর্শী লেখক হিসেবে তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের আত্মিক সংকটের কথা বলেছেন। বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর জটিল জীবনপরিক্রমার চিত্রায়ন করেছেন অকপট কথাশিল্পীর ইমেজ নিয়ে।

জুলফিকার মতিন একজন মৌলিক শিল্পী ভাষ্যকার। স্বকাল ও স্বদেশের জনসাধারণের সংস্কৃতিবোধ, সমাজের গতিধারা, রাজনৈতিক মতাদর্শ- এসবের সঠিক পরিধি উপস্থাপন তাকে বাস্তবতার বড় ধরনের রূপকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জুলফিকার মতিনের সাহিত্যের মেসেজ অনুসন্ধিৎসু পাঠকমনে যে কৌতূহলের জন্ম দেয়, যে প্রেরণায় এগিয়ে নিয়ে যায় তাদেও সেটাই ঔপন্যাসিক হিসেবে জুলফিকার মতিনের সার্থকতা । শুধু চরিত্রের দৃশ্যমান আবহের মধ্যে কথাসাহিত্যের নির্যাস সীমাবদ্ধ নয়, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের প্রতি তীব্র তীক্ষ্ম দৃষ্টি পাত, সচরাচর প্রচলিত জীবনবোধকে বিভিন্ন কৌণিক দৃষ্টিতে দেখে বিশ্লেষণ, মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের কারণ ও ফলাফল নির্ধারণের মধ্য দিয়ে একজন ঔপন্যাসসিকের আধুনিকমনস্কতা ফুটে ওঠে। নব্বই দশকের শিল্পভাষ্যকার জুলফিকার মতিনের শিল্পিত প্রসিদ্ধি মূলত উপর্যুক্ত প্রবণতার রূপকার হিসেবেই।

[১] জুলফিকার মতিন, *মানব মানবী*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬।